بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৪ মে ২০১৮, মোতাবেক ৪ হিজরত ১৩৯৭ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেছেন, **"হযরত নবী করীম (সা.)-এর আবির্ভাবের যুগে আরব জাতির সভ্যতা, নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিকতার কী অবস্থা ছিল। ঘরে ঘরে যুদ্ধ, মদ্য পান, ব্যভিচার এবং লুটতরাজ; মোটকথা সকল প্রকার নোংরামি তাদের মাঝে পাওয়া যেত। খোদা তা'লা এবং উন্নত নৈতিক চরিত্রের সাথে তাদের কোনো সংযোগ ও সম্পর্কই ছিল না। সবাই ফেরাউনের ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিল। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর আগমনের পর তারা যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তখন তাদের মাঝে এমন খোদাপ্রেম ও ঐক্যের প্রেরণা সৃষ্টি হয় যে, (মনে হচ্ছিল) সবাই যেন খোদার পথে মৃত্যুবরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছেন। তারা বয়আতের প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন এবং নিজদের কর্মের মাধ্যমে এর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।"**

তিনি (আ.) বলেন, **"মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা কত বড় বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যে, এর উদাহরণ পূর্বেও ছিল না আর পরবর্তীতেও দেখা যায় না।"** তিনি (আ.) বলেন, **"কিন্তু আল্লাহ্ চাইলে তিনি আবার তেমনই করতে পারেন। এসব দৃষ্টান্তের মাঝে অন্যদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। এই জামা'তেও"** (অর্থাৎ তিনি তাঁর নিজের জামা'ত সম্পর্কে বলছেন) **"আল্লাহ্ তা'লা এমন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে পারেন।"** তিনি (আ.) বলেন, **"আল্লাহ্ তা'লা সাহাবীদের প্রশংসায় কত সুন্দরই না বলেছেন যে, مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ** (সূরা আল্ আহযাব: ২৪)। **অর্থাৎ মু'মিনদের মাঝে এমন সুপুরুষও রয়েছে যারা খোদা তা'লার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে দেখিয়েছে। অতএব, তাদের অনেকেই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে আর অনেকেই প্রাণ বিসর্জনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।"** তিনি (আ.) বলেন, **"সাহাবীদের প্রশংসায় পবিত্র কুরআন থেকে বিভিন্ন আয়াত একত্রিত করা হলে দেখা যাবে এর চেয়ে বড় কোনো অনুকরণীয় আদর্শ নেই।"** (মলফূযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪৩১-৪৩৩; সংস্করণ-১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত) অর্থাৎ, এই আয়াতে উল্লিখিত আদর্শের চেয়ে উন্নত কোনো আদর্শের উল্লেখ তাঁর সাহাবীদের সম্পর্কে বর্ণিত হয় নি। অতএব, পুণ্য ও ত্যাগের এসব দৃষ্টান্ত আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।

বিগত কিছুদিন থেকে বিভিন্ন খুতবায় আমি সাহাবীদের জীবনচরিত তুলে ধরছি। যাদের মাঝে কতক বদরী সাহাবীও ছিলেন এবং কিছু অন্য সাহাবীও ছিলেন। কিন্তু আমার মনে হলো, প্রথমে শুধু বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের উল্লেখ করি, (কেননা) তাদের এক বিশেষ পদমর্যাদা রয়েছে। তাঁরা এমন মানুষ যাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হয়েছেন আর যাঁরা খোদার বিশেষ সন্তুষ্টি অর্জনকারী মানুষ ছিলেন।

আজ হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.)'র স্মৃতিচারণ করব। তাঁর স্মৃতিচারণে বিশেষত তিনি কীভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন এর উল্লেখ ইতিহাস ও হাদীসে বিশদভাবে রয়েছে। একইভাবে তাঁর শাহাদতের ঘটনারও রয়েছে। তিনি সৈয়্যদুশ্ শোহাদা

বা শহীদদের নেতা হিসেবে প্রসিদ্ধ। অনুরূপভাবে আসাদুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র সিংহ এবং আসাদুর রসূল বা রসূলের সিংহ উপাধিও তাঁর রয়েছে। হযরত হামযা (রা.) কুরাইশ সর্দার হযরত আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র এবং মহানবী (সা.)-এর চাচা ছিলেন। হযরত হামযা (রা.)'র মায়ের নাম ছিল **'হালাহ্'** এবং তিনি মহানবী (সা.)-এর শ্রদ্ধেয়া মাতা হযরত আমেনার চাচাত বোন ছিলেন। হযরত হামযা মহানবী (সা.)-এর চেয়ে বয়সে দু'বছর বা মতান্তরে চার বছরের বড় ছিলেন। **{ইস্তিয়াব ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৯, হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.), বৈরুতের দ্বারুল জলীল থেকে ১৯৯২ সনে মুদ্রিত}** **{উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৭, হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.), বৈরুতের দ্বারুল কুতুবিল্ ইলমিয়্যা থেকে ১৯৯৬ সনে মুদ্রিত}** হযরত হামযা (রা.) মহানবী (সা.)-এর দুধ ভাইও ছিলেন। সওবিয়া নামের একজন দাসী ছিলেন, তিনি তাদের উভয়কে দুধ পান করিয়েছিলেন। **{শারহে যুরকানী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৯৯, বাবু যিকরি বা'যি মানাকিবিল আব্বাস (রা.), বৈরুতের দ্বারুল কুতুবিল্ ইলমিয়্যা থেকে ১৯৯৬ সনে মুদ্রিত. মাকতাবাতুশ শামিলা থেকে সংগৃহীত}** মহানবী (সা.)-এর নবুওয়্যতের দাবির ৬ষ্ঠ বছরে দ্বারে আরকামের যুগে হযরত হামযা (রা.) ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা লিইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬ হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.), বৈরুতের দ্বারুল কুতুবিল্ ইলমিয়্যা থেকে ১৯৯০ সনে মুদ্রিত}** হযরত হামযা (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের ঘটনা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার আলোকে নিজের মতো করে বর্ণনা করেছেন। এর কিছু সারকথা আমি তুলে ধরব আর কিছুটা বিস্তারিত বিবরণও। এটি শোনার পর মানুষ যখন কল্পনা করে, হযরত হামযা (রা.) কীভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছেন আর এর কারণ কী ছিল এবং মহানবী (সা.)-এর ওপর আবু জাহলের অত্যাচার করার পর কীভাবে তার মাঝে মহানবী (সা.)-এর জন্য আত্মাভিমান জাগ্রত হয়। যাহোক, এই ঘটনার উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, একদিন মহানবী (সা.) সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসে ছিলেন আর নিশ্চিতভাবে এটিই ভাবছিলেন যে, আল্লাহ্‌র একত্ববাদ কীভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। এমন সময় আবু জাহল সেখানে উপস্থিত হয় আর সে এসেই বলে, (হে) মুহাম্মদ (সা.)! তুমি তোমার এসব কথা বলা থেকে বিরত হচ্ছ না কেন? একথা বলেই সে মহানবী (সা.)-কে চরম অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে আরম্ভ করে। তিনি (সা.) নীরবে তার গালিগালাজ শুনতে থাকেন এবং সহ্য করেন। একটি শব্দও তিনি (সা.) মুখ থেকে বের করেন নি। ইচ্ছে মতো গালি দেয়ার পর হতভাগা আবু জাহল এগিয়ে আসে এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখে চপেটাঘাত করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি (সা.) তাকে কিছুই বলেন নি। মহানবী (সা.) যে জায়গায় বসেছিলেন আর আবু জাহল যেখানে গালি দিয়েছিল এর সামনেই হযরত হামযা (রা.)'র বাড়ি ছিল। হযরত হামযা (রা.) তখনো ঈমান আনয়ন করেন নি। তার দৈনন্দিন রীতি ছিল, অর্থাৎ প্রতিদিন সকালে তিনি তির ও ধনুক নিয়ে শিকারে চলে যেতেন আর সন্ধ্যায় ফিরে আসতেন এবং এরপর কুরাইশের বিভিন্ন আসরে বসতেন। সেদিন আবু জাহল যখন মহানবী (সা.)-কে গালিগালাজ করে এবং চরম জঘন্য ব্যবহার করে তখন হযরত হামযা (রা.) শিকারে গিয়েছিলেন। কিন্তু আবু জাহল যখন এসব করছিল তখন ঘটনাক্রমে হযরত হামযা (রা.)'র পরিবারের এক দাসী দরজায় দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছিল। আবু জাহল যখন বার বার তাঁর (সা.) ওপর আক্রমণ করছিল আর তাঁকে নির্বিচারে গালিগালাজ করছিল তখন তিনি (সা.) নীরবে এবং গাম্ভীর্যের সাথে তার গালিগালাজ সহ্য করছিলেন। সেই

দাসী দরজায় দাঁড়িয়ে পুরো দৃশ্য অবলোকন করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, নিঃসন্দেহে সে এক মহিলা ছিল আর অবিশ্বাসী ছিল, কিন্তু পুরোনো যুগে মক্কার মানুষ যেখানে তাদের দাসদের ওপর যুলুম-নির্যাতন করত সেখানে এ রীতিও ছিল যে, কোনো কোনো সম্ভ্রান্ত মানুষ তাদের দাসদের সাথে সদ্ব্যবহার করত আর দীর্ঘকাল পর সেই দাসকে ঐ পরিবারের অংশ মনে করা হতো। হযরত হামযা (রা.)'র পরিবারের দাসী এমনই ছিল। সে যখন এসব দৃশ্য দেখে আর স্বচক্ষে সবকিছু অবলোকন করে এবং নিজের কানে সব কথা শোনে তখন তার ওপর এর গভীর প্রভাব পড়ে, কিন্তু কিছু করতে পারছিল না। সে দেখতে থাকে এবং শুনতে থাকে আর ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ হতে থাকে এবং ছটফট করতে থাকে আর জ্বলতে থাকে। মহানবী (সা.) সেখান থেকে উঠে চলে যাওয়ার পর সেই (দাসীও) নিজের কাজে মনোনিবেশ করে। সন্ধ্যায় হযরত হামযা (রা.) যখন শিকার শেষে ফিরে এসে বাহন থেকে নামেন আর তির ও ধনুক হাতে নিয়ে নিজের বীরত্ব ও গর্ব প্রদর্শনের বিশেষ ভঙ্গিতে বাড়িতে প্রবেশ করেন তখন সেই দাসী উঠে দাঁড়ায়। দীর্ঘক্ষণ যাবৎ সে নিজের ক্রোধ ও দুঃখের ভাবাবেগ চেপে রেখেছিল। সে অত্যন্ত উচ্চঃস্বরে হযরত হামযা (রা.)-কে বলে, তুমি তো অনেক বড় বীর সেজে ঘুরে বেড়াও, তোমার কি লজ্জা হয় না? হামযা (রা.) একথা শুনে আশ্চর্য হয় এবং বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে ব্যাপার কী? সেই দাসী বলে, ব্যাপার আর কী, তোমার ভাতিজা মুহাম্মদ (সা.) এখানে বসেছিলেন, তখন আবু জাহল এসে মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করে এবং নির্বিচারে গালিগালাজ করে আর এরপর তাঁর গালে থাপ্পড় মারে, কিন্তু মুহাম্মদ (সা.) উফ্ পর্যন্ত করেন নি বরং নীরবে শুনতে থাকেন। আবু জাহল অনবরত গালমন্দ করতে থাকে আর অবশেষে গালি দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে চলে যায়। এ সত্ত্বেও আমি দেখলাম মুহাম্মদ (সা.) তার কোনো কথার উত্তর দেন নি। তুমি বড় বীর সেজে ঘুরে বেড়াও আর দম্ভের সাথে শিকার থেকে ফিরে এসেছ। তোমার কি লজ্জা হয় না যে, তোমার জীবদ্দশায় তোমার ভাতিজার সাথে এমন দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে? হযরত হামযা (রা.) তখনো মুসলমান হন নি। মহানবী (সা.) যে সত্য– এটি জানা সত্ত্বেও তিনি মক্কার কুরাইশ নেতৃবর্গের একজন হওয়ার কারণে এবং রাজত্বের জন্যেও ইসলাম গ্রহণে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। হামযা (রা.) তখনও নিজের মর্যাদা এবং প্রভাব প্রতিপত্তিকে ঈমানের জন্য জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু দাসীর কাছে এ ঘটনা শোনার পর তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে যান এবং তার পারিবারিক আত্মাভিমান জাগ্রত হয়। তাই তিনি বিশ্রাম না করে ঐ অবস্থায়ই ক্রুদ্ধ হয়ে কাবা অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রথমে তিনি কাবা শরীফ তওয়াফ করেন। এরপর সেই বৈঠকের দিকে অগ্রসর হন যেখানে আবু জাহল বসেছিল। সেখানে সে খুবই গালগল্প করছিল আর এ ঘটনাকে রসিয়ে রসিয়ে শোনাচ্ছিল এবং দম্ভের সাথে বর্ণনা করছিল যে, আজকে আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে এভাবে গালিগালাজ করেছি আর তাঁর সাথে এই ব্যবহার করেছি। হামযা (রা.) সেই বৈঠকে পৌঁছা মাত্রই ধনুক দিয়ে আবু জাহলের মাথায় সজোরে আঘাত করেন আর বলেন, তুমি তোমার বীরত্বের দাবি করছ এবং মানুষকে শোনাচ্ছ যে, আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে এভাবে লাঞ্ছিত করেছি আর মুহাম্মদ (সা.) উফ্ পর্যন্ত করেন নি! এখন আমি তোকে লাঞ্ছিত করছি, যদি তোর সাহস থাকে তাহলে আমার সামনে কথা বল। আবু জাহল তখন মক্কায় এক বাদশাহর পদমর্যাদা রাখত, জাতির নেতা ছিল, ফেরাউনের মতো

অবস্থা ছিল তার। এই ঘটনা দেখে তার সাথিরা চরম উত্তেজনার সাথে দণ্ডায়মান হয় এবং হামযা (রা.)'র ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয় কিন্তু আবু জাহল মহানবী (সা.)-এর নীরবে গালিগালাজ সহ্য করার কারণে আর এখন হামযার বীরত্ব ও সাহসিকতার কারণে আতঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। সে তাদের মাঝে এসে দাঁড়ায় এবং লোকদেরকে আক্রমণ করতে বাধা দেয় আর বলে, যেতে দাও, আসলে আমিই বাড়াবাড়ি করেছিলাম আর হামযা ন্যায়সঙ্গত কথা বলছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজের ভাষায় লিখেছেন যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন সাফা ও মারওয়া পাহাড় থেকে বাড়ি ফিরেছিলেন তখন তো তিনি মনে মনে বলছিলেন, ঝগড়া করা আমার কাজ নয় বরং (আমার কাজ হলো) ধৈর্যের সাথে গালমন্দ সহ্য করা। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আরশে বলছিলেন, **أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ** (সূরা আয্ যুমারঃ ৩৭) অর্থাৎ, **হে মুহাম্মদ (সা.)! তুমি ঝগড়াবিবাদের জন্য প্রস্তুত নও বলে কি আমি নেই, যে তোমার স্থলে তোমার শত্রুর মোকাবিলা করবে?** অতএব, আল্লাহ্ তা'লা সে দিনই তাঁকে (সা.) আবু জাহলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো এক নিবেদিতপ্রাণ দান করেন। হযরত হামযা (রা.) সেই বৈঠকেই, যাতে তিনি আবু জাহলের মাথায় ধনুক দিয়ে আঘাত করেছিলেন, ঈমান আনার ঘোষণা দেন আর আবু জাহলকে সম্বোধন করে বলেন, তুমি মুহাম্মদ (সা.)-কে গালিগালাজ করেছ কেবল এ কারণে যে, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রসূল আর আমার প্রতি ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হয়? তাহলে কান খুলে শুনে রাখো! আমিও আজ থেকে মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছি আর আমিও সেসব কথাই বলছি যা মুহাম্মদ (সা.) বলেন, যদি সৎসাহস থাকে তাহলে আসো আর আমার মোকাবিলা করে দেখো। একথা বলে হযরত হামযা (রা.) মুসলমান হয়ে যান। **(রসূলে করীম (সা.) কি যিন্দেগী কে তামাম আহাম ওয়াকেয়াত, আনোয়ারুল উলূম, ১৯শ তম খণ্ড, পৃঃ ১৩৭-১৩৯)**

বিভিন্ন রেওয়ায়েতে আছে হযরত হামযা (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের পর মক্কার মুসলমানদের ঈমান খুবই দৃঢ়তা লাভ করে। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা লিইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬, হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.), বৈরুতের দ্বারুল কুতুবিল্ ইলমিয়্যা থেকে ১৯৯০ সনে মুদ্রিত}** বরং ইংরেজ ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়াম মুইরও এ কথা উল্লেখ করেছেন যে, **হযরত হামযা এবং হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণের ফলে মুহাম্মদ (সা.)-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দৃঢ়তা লাভ করে। (The life of Mohammad by sir William Muir, heading the Prophet Insulted pg. 89 Edition 1923)** হযরত হামযা (রা.) অন্যান্য মুসলমানের সাথে মদীনা অভিমুখে হিজরত করেন আর সেখানে গিয়ে হযরত কুলসুম বিন হিদমের বাড়িতে অবস্থান করেন। মতান্তরে তিনি হযরত সা'দ বিন খায়সামার গৃহে অবস্থান করেন। যাহোক, হিজরত করে মদীনায় আসার পর মহানবী (সা.) হযরত হামযা এবং হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। উহুদের যুদ্ধে যাওয়ার সময় হযরত হামযা (রা.) এর ভিত্তিতেই হযরত যায়েদের অনুকূলে ওসীয়্যত করে যান। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা লিইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬, হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.), বৈরুতের দ্বারুল কুতুবিল্ ইলমিয়্যা থেকে ১৯৯০ সনে মুদ্রিত}**

মদীনায় হিজরতের পরও কাফিরদের দুষ্কৃতি বন্ধ হয় নি। তাদের উত্যক্ত করা এবং মুসলমানদের বিরক্ত করা বন্ধ হয় নি। তাই মুসলমানদের খুবই সতর্ক থাকতে হতো এবং কাফিরদের গতিবিধির ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখতে হতো। রেওয়ায়েতে আছে কুরাইশের

গতিবিধি এবং তাদের দুষ্কৃতি সম্পর্কে খোঁজখবর রাখার জন্য মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন অভিযান পরিচালনার প্রয়োজন পড়ে যাতে হযরত হামযা (রা.) অসাধারণ সেবা প্রদানের সুযোগ পেয়েছেন। দ্বিতীয় হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে মহানবী (সা.) হযরত হামযা (রা.)'র নেতৃত্বে ৩০জন উষ্ট্রারোহী মুহাজিরের একটি দল 'ঈস' অভিমুখে প্রেরণ করেন। হামযা (রা.) এবং তাঁর সাথিরা দ্রুতবেগে সেখানে পৌঁছে দেখেন মক্কার সবচেয়ে বড় নেতা আবু জাহল ৩০০ অশ্বারোহীর একটি দল নিয়ে তাদের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। মুসলমানদের সংখ্যার চেয়ে এই সংখ্যা দশগুণ অধিক ছিল। কিন্তু মুসলমানরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর নির্দেশের অনুবর্তিতায় বাড়ি থেকে যাত্রা করেছিলেন, মৃত্যুভয় তাদেরকে পিছু হটাতে পারত না। উভয় দলই পরস্পরের মুখোমুখি হয়, সারিবদ্ধ হওয়া আরম্ভ হয়ে যায় আর যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার উপক্রম হচ্ছিল এমন সময় সেই অঞ্চলের নেতা মাজদী বিন আমর আল্ জুহনী যিনি উভয় পক্ষের সাথে সুসম্পর্ক রাখতেন তিনি উভয়ের মাঝে এসে মধ্যস্থতা করেন আর যুদ্ধ আরম্ভ হতে গিয়েও থেমে যায়। **{হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম, এ (রা.) প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক থেকে সংগৃহীত, পৃঃ ৩২৯}**

রেওয়ায়েতে এটিও রয়েছে যে, মহানবী (সা.) প্রথম পতাকা বা ঝান্ডা হযরত হামযা (রা.)-কে দিয়েছিলেন। যদিও কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আবু উবায়দা এবং হযরত হামযা (রা.)'র সেনাবাহিনী এক সাথেই যাত্রা করেছিল। এর ফলে সন্দেহ জাগে যে, (পতাকা কাকে দিয়েছিলেন)। যাহোক, দ্বিতীয় হিজরীতে বনু কায়নুকার যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর পতাকা হযরত হামযা (রা.)ই বহন করেছিলেন। **(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃঃ ২৮৩, বাব সারীয়্যাহ্ হামযা ইলা সাইফিল বাহ্র, বৈরুতের দ্বার ইবনে হাযম থেকে ২০০৯ সনে মুদ্রিত)**

আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মসম্মানবোধ অটুট ও অক্ষুন্ন রাখা উত্তম এবং সর্বদা এটি বজায় রাখা উচিত– মহানবী (সা.)-এর এই নির্দেশ হযরত হামযা (রা.) সব সময় মেনে চলেছেন এবং এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেছেন। যেভাবে রেওয়ায়েতে এসেছে, মদীনায় হিজরতের পর অন্যান্য মুসলমানদের মতো হযরত হামযা (রা.)'র অর্থনৈতিক অবস্থারও খুবই অবনতি ঘটেছিল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) বর্ণনা করেন, সে সময় একদিন হযরত হামযা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন এবং নিবেদন করেন, আমার ওপর কোনো দায়িত্ব ন্যস্ত করুন যেন জীবিকার কোনো ব্যবস্থা করতে পারি। তখন মহানবী (সা.) তাঁকে বলেন, হে হামযা! নিজের আত্মসম্মান অটুট ও অক্ষুন্ন রাখা বেশি পছন্দনীয় নাকি সেটিকে পদদলিত করা? হযরত হামযা (রা.) বলেন, আমি তো সেটি অটুট ও অক্ষুন্ন রাখাই পছন্দ করি। তিনি (সা.) বলেন, তাহলে নিজের আত্মসম্মানের সুরক্ষা করো। **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬২৪, হাদীস নম্বরঃ ৬৬৩৯, বৈরুতের আলেমুল কুতুব থেকে ১৯৯৮ সনে মুদ্রিত)**

এরপর মহানবী (সা.) হযরত হামযা (রা.)-কে দোয়ার প্রতি মনোনিবেশের আহ্বান জানান এবং বিশেষ কিছু দোয়া শেখান। অতএব, হযরত হামযা (রা.)'র-ই রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছিলেন, এই দোয়াকে আবশ্যক করে নাও যে,

اَللّٰهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الاَعْظَمِ وَ رِضوَانِكَ الاَكبَر

{আল্ ইসবাহ্ ফি তামীযিস্ সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৬, হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবিল্ ইলমিয়্যা থেকে ১৯৯৫ সনে মুদ্রিত} অর্থাৎ **'হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে তোমার সর্বমহান নাম এবং তোমার সর্বাধিক সন্তুষ্টির দোহাই দিয়ে যাচনা করছি'**। পরবর্তীতে

সর্বদা তিনি এর সুফল ভোগ করেছেন। দোয়ার প্রতি হযরত হামযা (রা.)'র কত বেশি ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে এরও বহিঃপ্রকাশ ঘটে। হবেই বা না কেন? এসব দোয়ার কল্যাণেই বাহ্যত এই রিক্তহস্ত ও অসহায় মুহাজিরকে আল্লাহ্ তা'লা বাড়িঘর এবং প্রয়োজনীয় সব কিছুই দিয়েছেন। কিছুকাল পর হযরত হামযা (রা.) বনু নাজ্জারের এক আনসার মহিলা খওলা বিনতে কায়েসকে বিয়ে করেন। মহানবী (সা.) তাঁর বাড়িতে যেতেন। হযরত খওলা (রা.) পরবর্তীতে মহানবী (সা.)-এর সেই যুগের ভালোবাসাপূর্ণ কথা শোনাতেন। তিনি বলতেন, একবার মহানবী (সা.) আমাদের বাড়ি আসেন। আমি (তাঁকে) নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি জানতে পেরেছি, আপনি বলে থাকেন যে, কিয়ামত দিবসে আপনাকে হওযে কওসার দেয়া হবে যা অনেক বিস্তৃত হবে। মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ এটি সত্য আর এটিও শুনে রাখো যে, অন্য সাধারণ লোকদের তুলনায় তোমার জাতি আনসারের এই হওয থেকে পরিতৃপ্ত হওয়াটা আমার নিকট বেশি পছন্দনীয়। **{মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৮২২, হাদীস নম্বরঃ ২৭৮৫৯, মুসনদ খওলা বিনতে হাকীম (রা.), বৈরুতের আলেমুল কুতুব থেকে ১৯৯৮ সনে মুদ্রিত}** আনসারের প্রতি তাঁর (সা.) কত গভীর ভালোবাসা ছিল! আর তা শুধু এই কারণে যে, স্বজাতি তাঁকে বহিষ্কার করলে তখন এই আনসাররাই তাঁর জন্য সব কিছু উৎসর্গ করে দিয়েছে।

ইতিহাসে বদরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে একটি ঘটনার উল্লেখ এভাবেও পাওয়া যায় যে, দ্বিতীয় হিজরীতে প্রসিদ্ধ বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বদরের যুদ্ধের সময় কাফিরদের পক্ষ থেকে আসওয়াদ বিন আব্দুল আসাদ মাখযুমী বেরিয়ে আসে। সে চরম দুষ্কৃতিপরায়ণ ও দুষ্ট মানুষ ছিল। সে শপথ করেছিল যে, মুসলমানরা পানির জন্য যে জায়গা রেখেছিল আমি অবশ্যই মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সেই হওয বা জলাধার থেকে পানি পান করব বা সেটি ভেঙ্গে ফেলব কিংবা সেটিকে নষ্ট করব অথবা এর পাশে গিয়ে মরে যাব। সে এই সংকল্প নিয়ে রওয়ানা হয়। হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.) তাকে মোকাবিলার জন্য আসেন। উভয়ে যখন মুখোমুখি হয় তখন হযরত হামযা (রা.) তরবারির আঘাতে তার (পায়ের) গোছার অর্ধেক কেটে ফেলেন। সে হওযের পাশেই ছিল, সে কোমরের ওপর ভর করে স্বীয় শপথ পূর্ণ করার জন্য হওযের দিকে অগ্রসর হয়। হযরত হামযা (রা.) তার পিছু ধাওয়া করেন এবং আরেকটি আঘাতে তার ভবলীলা সাঙ্গ করেন। **(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃঃ ২৯৮-২৯৯ বাব মাকতালিল আসওয়াদ বিন আব্দুল আসাদ আল্ মাখযূমী, বৈরুতের দ্বার ইবনে হাযম থেকে ২০০৯ সনে মুদ্রিত)** সে হওয বা জলাধারের পাশে মারা যায় ঠিকই কিন্তু পানি পান করার বা জলাধার নষ্ট করার তার যে সংকল্প তার ছিল তা সে কোনোক্রমেই পূরণ করতে পারে নি।

হযরত আলী (রা.) বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করেন, এতে কাফিরদের সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার সমীপে সারারাত বিনয়াবনত দোয়া এবং কাকুতি মিনতিতে নিমগ্ন থাকেন। কাফির সৈন্যরা যখন আমাদের নিকটবর্তী হয় আর আমরা তাদের সামনে সারিবদ্ধ হই তখন হঠাৎ এক ব্যক্তির ওপর দৃষ্টি পড়ে, সে লাল উটে আরোহী ছিল আর লোকদের মাঝে তার বাহন বিচরণ করছিল। মহানবী (সা.) বলেন, হে আলী! হামযা কাফিরদের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস করো লাল উষ্ট্রারোহী ব্যক্তিটি কে আর কী বলছে? এরপর মহানবী (সা.) বলেন, এদের মাঝে কেউ যদি তাদেরকে কল্যাণ ও মঙ্গলের কোনো হিতোপদেশ দিতে পারে

তাহলে তা একমাত্র সেই লাল উষ্ট্রারোহী ব্যক্তিই দিতে পারে। তখন হযরত হামযা (রা.) এসে বলেন, উতবা বিন রবীয়্যা কাফিরদেরকে যুদ্ধ করতে বারণ করছে। প্রত্যুত্তরে আবু জাহল তাকে বলেছে, তুমি ভীরু এবং যুদ্ধ করতে ভয় পাও। উতবা উত্তেজিত হয়ে বলে, আজকে দেখব যে, কে ভীরু। **{মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৮-৩৩৯, হাদীস নংঃ ৯৪৮, মুসনাদ আলী বিন আবী তালিব (রা.), বৈরুতের আলেমুল কুতুব থেকে ১৯৯৮ সনে মুদ্রিত}** হযরত আলী (রা.) বলেন, উতবা বিন রবীয়্যা আর তার পেছনে তার ছেলে এবং ভাইও বেরিয়ে আসে আর চিৎকার করে বলে, আমাদের বিরুদ্ধে কে অবতীর্ণ হবে? তখন বেশ কয়েকজন আনসার যুবক তাদের কথার উত্তর দেয়। উতবা জিজ্ঞেস করে, তোমরা কারা? তারা উত্তর দেন, আমরা আনসার। উতবা বলে, তোমাদের সাথে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই, আমরা তো শুধু আমাদের চাচার ছেলেদের সাথে যুদ্ধের ইচ্ছা রাখি। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, হে হামযা! উঠো, হে আলী! দণ্ডায়মান হও, হে উবায়দা বিন হারেছ! সন্মুখে এগিয়ে যাও। হামযা (রা.) উতবার দিকে এগিয়ে যান। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি শায়বার দিকে অগ্রসর হই। উবায়দা ও ওয়ালীদের মাঝে যুদ্ধ হয় আর উভয়ই পরস্পরকে গুরুতর আহত করে। এরপর আমরা ওয়ালীদের দিকে অগ্রসর হই এবং তাকে হত্যা করি আর উবায়দাকে রণক্ষেত্র থেকে তুলে নিয়ে আসি। **(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল্ জিহাদ বাবু ফিল মুবারাযাহ, হাদীস নংঃ ২৬৬৫)** হযরত আলী এবং হামযা (রা.) উভয়ই তাদের নিজ নিজ প্রতিপক্ষকে হত্যা করেছিলেন। মহানবী (সা.) যখন বলেন, হে হামযা! উঠো, হে আলী! দাঁড়াও, হে উবায়দা বিন হারেছ! সম্মুখে এগিয়ে যাও; তখন তারা তিনজনই দণ্ডায়মান হয়ে উতবার দিকে অগ্রসর হলে সে বলে, তোমরা কিছু বলো যেন আমরা তোমাদের চিনতে পারি। কেননা তারা শিরস্ত্রাণ পরিহিত ছিলেন, মুখ ঢাকা ছিল। তখন হযরত হামযা (রা.) বলেন, আমি হামযা, যে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর সিংহ, একথা শুনে উতবা বলে, ভালো প্রতিদ্বন্দ্বী। **(আত্ তাবাকাতুল্ কুবরা লিইবনে সা'দ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২, বৈরুতের দ্বারুল কুতুবল ইলমিয়্যা থেকে ১৯৯০ সনে মুদ্রিত)** হযরত হামযা (রা.)'র বীরত্বের চিত্র এমন ছিল যে, বদরের যুদ্ধে তিনি কাফিরদের মাঝে ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে উট পাখির পালক যুদ্ধের প্রতীক হিসেবে লাগিয়ে রেখেছিলেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়ছে, উমাইয়্যা বিন খালাফ কুরাইশের একজন নেতা ছিল। হযরত বেলাল (রা.)-কে সে মক্কায় কষ্ট দিত। বদরের যুদ্ধে সে আনসারের হাতে নিহত হয়। সে আমাকে জিজ্ঞেস করে, কে এই ব্যক্তি যার বক্ষে উট পাখির পালক লাগানো রয়েছে? উত্তরে আমি বলি, ইনি হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.)। তখন উমাইয়্যা বলে উঠে, এই হলো সেই ব্যক্তি যে আজ আমাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে। **(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃঃ ৩০২, বাব মাকতুল উমাইয়্যা বিন খালফি, বৈরুতের দ্বার ইবনে হাযম থেকে ২০০৯ সনে মুদ্রিত)**

ইংরেজ ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়াম ম্যুর বদরের যুদ্ধের স্মৃতিচারণে হযরত হামযা (রা.)'র উপস্থিতি সম্পর্কে লিখেন, **হামযা দুলতে থাকা উট পাখির পালকসহ সর্বত্র বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হতেন**। **(The life of Mohammad by sir William Muir, heading Battle of Ohod pg. 260, Edition-1923)**

আরো বেশ কয়েকজন কাফির নেতাকেও তিনি যুদ্ধে হত্যা করেন।

উহুদের যুদ্ধেও হযরত হামযা (রা.) বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তাঁর এই বীরত্ব মক্কার কুরাইশের দৃষ্টিতে খুবই অসহনীয় লাগছিল। বুখারীতে এর বিশদ বিবরণ এভাবে উল্লেখ রয়েছে,

হযরত জাফর বিন আমর বিন উমাইয়্যা জামরী বলেন, আমি উবায়দুল্লাহ্ বিন আদী বিন খিয়ারের সাথে সফরে যাই। আমরা সিরিয়ার প্রসিদ্ধ শহর হিম্‌সে পৌঁছলে উবায়দুল্লাহ্ বিন আদী আমাকে বলেন, আপনি কি ওয়াহশী বিন হারব হাবশীর সাথে সাক্ষাৎ করতে চান (যাতে) হযরত হামযা (রা.)'র হত্যা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন? তিনি বলেন, ঠিক আছে। ওয়াহশী হিম্‌সে থাকত। অতএব, আমরা তার ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে আমাদের বলা হয়, ঐ তো সে তার বাড়ির ছায়ায় এমনভাবে বসে আছে যেন বৃহৎ কোনো মশক বা চামড়ার থলে। জাফর বলেন, আমরা তার কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি এবং আসসালমু আলাইকুম বলি। সে সালামের উত্তর দেয়। (তারা) বলতেন, উবায়দুল্লাহ্ তখন পাগড়ি পরিহিত ছিলেন, মাথা ও মুখ আবৃত ছিল, ওয়াহশী কেবল তার চোখ ও পা-ই দেখতে পারত। উবায়দুল্লাহ্ বলেন, হে ওয়াহশী! আমাকে চিনতে পারছ কি? তিনি বলেন, সে তাকে গভীরভাবে দেখে এবং বলে, আল্লাহ্‌র কসম! না। কিন্তু আমি শুধু এতটুকু জানি যে, আদী বিন খিয়ার এক মহিলাকে বিয়ে করেছিল, যার নাম ছিল উম্মে কিতাল বিনতে আবী লেয়স। মক্কায় তার গর্ভে আদীর এক সন্তান হয় আর আমি তাকে দুধ পান করাতাম এবং শিশুকে কোলে নিয়ে তার মায়ের সাথে যেতাম আর সেই শিশুকে তার মায়ের কাছে দিয়ে দিতাম। আমি তোমার পা দেখেছি, এ থেকে মনে হয় তুমি সেই ব্যক্তি। (অর্থাৎ, সে পা দেখেই চিনে ফেলে।) এ কথা শুনে উবায়দুল্লাহ্ নিজের মুখ অনাবৃত করেন। তখন তিনি বলেন, আমাদেরকে হযরত হামযা (রা.)'র হত্যার ঘটনা শোনাও। সে বলে, হযরত হামযা (রা.) তোআয়মা বিন আদী বিন খিয়ারকে বদরের যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন। আমার মনিব জুবায়ের বিন মুতঈম আমাকে বলেন, তুমি যদি আমার চাচার (হত্যার) প্রতিশোধস্বরূপ হামযাকে হত্যা করতে পারো তাহলে তুমি মুক্তি পাবে। সে বলে, লোকেরা যখন দেখল, উহুদের যুদ্ধ আরম্ভ হতে যাচ্ছে আর আয়নাঈন হলো উহুদের পাহাড়গুলোর একটি। উহুদ এবং এর মাঝে একটি উপত্যকা রয়েছে। লোকদের সাথে আমিও যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। মানুষ যখন যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হয় তখন সিবা' যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে হাঁক ছেড়ে বলে, কেউ কি প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মাঠে নামবে? একথা শুনে হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব তার প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য বেরিয়ে পড়েন এবং বলেন, হে সিবা'! তুমি কি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছ? একথা বলে হযরত হামযা (রা.) তার ওপর আক্রমণ করেন এবং তার পাঠ চুকিয়ে দেন (অর্থাৎ, তাৎক্ষণিকভাবে তাকে পরাভূত করে হত্যা করেন।) ওয়াহশী বলে, আমি হযরত হামযা (রা.)'র জন্য একটি বড় পাথরের আড়ালে ওঁৎ পেতে বসে থাকি আর আমার কাছে আসতেই আমি আমার বর্ষা দিয়ে আঘাত করি এবং তার নাভির নিচে বর্ষা রেখে জোরে চাপ দিতেই তা বিপরীত দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। এটিই তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত ছিল। মানুষ যখন যুদ্ধের পর ফিরে যায় তখন আমিও তাদের সাথে ফিরে যাই এবং মক্কাতেই অবস্থান করতে থাকি, কিন্তু সেখানে যখন ইসলামের প্রসার ঘটে তখন আমি সেখান থেকে তায়েফ চলে যাই। মানুষ মহানবী (সা.)-এর কাছে দূত প্রেরণ করে আর আমাকে বলা হয়

যে, তিনি (সা.) দূতদের সাথে বিবাদ করেন না, (অর্থাৎ তিনি দূতদের কিছুই বলেন না।) আমিও তাদের সাথে যাই। আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে যাওয়ার পর তিনি (সা.) আমাকে দেখে বলেন, তুমিই কি সেই ওয়াহশী? আমি বলি, জী হ্যাঁ। তিনি (সা.) বলেন, তুমিই কি হামযাকে হত্যা করেছিলে? আমি বলি, আপনি সঠিক শুনেছেন। তিনি (সা.) বলেন, যদি সম্ভব হয় তাহলে তুমি আর আমার সামনে এসো না। সে বলে, এ কথা শুনে আমি সেখান থেকে বেরিয়ে যাই। মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর মুসায়লামা কাজ্জাব যখন বিদ্রোহ করে তখন আমি বলি, মুসায়লামার কাছে আমি অবশ্যই যাব। হয়তো তাকে হত্যা করার মাধ্যমে হযরত হামযাকে (হত্যার) প্রায়শ্চিত্ত বা পাপ মোচন করতে পারব। তিনি বলেন, আমিও লোকদের সাথে যুদ্ধের জন্য বের হই। যুদ্ধের অবস্থা যা হওয়ার তাই হয়। আমি দেখি, এক ব্যক্তি দেয়ালের একটি গহ্বরে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছিল যেন গোধূম বর্ণের কোনো উট, মাথার চুল এলোমেলো। সে বলে, আমি সেই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বল্লম ছুড়ে মারি এবং (সেই বল্লম) তার বুকের মাঝখানে ধরে জোরে চাপ দেই আর তা তার উভয় কাধের মধ্য দিয়ে ভেদ করে বেরিয়ে যায়, এরপর এক আনসারীও তার শিরোচ্ছেদ করে। অতএব, পরবর্তীতে তার এই পরিণাম হয়। **{সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু কাতলি হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.), হাদীস নং: ৪০৭২}**

উমায়ের বিন ইসহাক কর্তৃক এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, উহুদের দিন হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.) মহানবী (সা.)-এর সন্মুখভাগে দুটি তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করছিলেন এবং বলছিলেন, আমি আসাদুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র সিংহ। একথা বলতে বলতে তিনি কখনো সামনে অগ্রসর হতেন আবার কখনো পশ্চাতে যেতেন। এ অবস্থায়ই তিনি পা পিছলে চিৎ হয়ে পড়ে যান। ওয়াহশী আসওয়াদ তাকে দেখে ফেলে। আবু ওসামা বলেন, সে তাকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করে এবং হত্যা করে। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা লিইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮, হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.), বৈরুতের দ্বারুল কুতুবল্ ইলমিয়্যা থেকে ১৯৯০ সনে মুদ্রিত}** আর হযরত হামযা মহানবী (সা.)-এর হিজরতের পর বত্রিশতম মাসে উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন, তখন তাঁর বয়স ছিল ঊনষাট বছর। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা লিইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬, হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.), বৈরুতের দ্বারুল কুতুবল্ ইলমিয়্যা থেকে ১৯৯০ সনে মুদ্রিত}** রেওয়ায়েতটি হলো, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা উহুদের যুদ্ধের দিন সৈন্যবাহিনীর সাথে আসে। সে তার পিতা যে বদরের যুদ্ধে হযরত হামযা (রা.)'র সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা পড়ে তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এই মানত করেছিল যে, সুযোগ পেলে আমি হামযার কলিজা চিবিয়ে খাবো। যখন এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং হযরত হামযার ওপর বিপদ আপতিত হয় তখন মক্কার মুশরিকরা নিহত (মুসলমানদের) অঙ্গচ্ছেদ করে। (অর্থাৎ,) তারা তাদের চেহারা বিকৃত করে যেমন নাক, কান ইত্যাদি অঙ্গ কেটে ফেলে। তারা হযরত হামযা (রা.)'র কলিজার একটি টুকরো নিয়ে আসে। হিন্দা সেটি নিয়ে খাওয়ার উদ্দেশ্যে চিবাতে থাকে, কিন্তু সে তা গিলতে না পেরে মুখ থেকে ফেলে দেয়। এই ঘটনা অবগত হওয়ার পর মহানবী (সা.) বলেন, হযরত হামযার (দেহের) মাংসের কোনো অংশ স্পর্শ করাকে আল্লাহ্ তা'লা আগুনের জন্য চিরতরে হারাম করে দিয়েছেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা লিইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮, হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.), বৈরুতের দ্বারুল কুতুবল্ ইলমিয়্যা থেকে ১৯৯০ সনে মুদ্রিত}** মহানবী (সা.) হযরত হামযার লাশের পাশে এসে যে ভাবাবেগ প্রকাশ করেন এবং তাকে মহান

মর্যাদার যে শুভসংবাদ দেন, সে সম্পর্কে রেওয়ায়েত রয়েছে, মহানবী (সা.) যখন হযরত হামযার লাশ দেখেন তখন (দেখতে পান), তার কলিজা বের করে চিবানো হয়েছে। ইবনে হিশাম বলেন, ইতিহাসে লিখা আছে, এ অবস্থায় হযরত হামযার লাশের পাশে দাঁড়িয়ে মহানবী (সা.) বলেন, হে হামযা! তোমার এই বিপদের মতো আর কোনো বিপদেরই আমি কখনো সম্মুখীন হব না। (অর্থাৎ) এর চেয়ে বেশি কষ্টদায়ক দৃশ্য আমি আজ পর্যন্ত দেখি নি। এরপর তিনি (সা.) বলেন, **"জিব্রাঈল এসে আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, সাত আকাশে হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিবের নাম আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সিংহ হিসেবে লেখা হয়েছে"।** **(সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃঃ ৩৯৫, বাব ওকূফুন নবীয়্যি আলা হামযাহ ওয়া হুযনুহু আলাইহে, বৈরুতের দ্বার ইবনে হাযম থেকে ২০০৯ সনে মুদ্রিত)**

হযরত যুবায়ের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, উহুদের দিন যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এক মহিলাকে সম্মুখ দিক থেকে খুব দ্রুত গতিতে আসতে দেখা যায়। তিনি শহীদদের লাশ প্রায় দেখেই ফেলেছিলেন। কিন্তু কোনো মহিলার সেখানে এসে লাশ দেখাটা মহানবী (সা.) সমীচীন মনে করেন নি। কেননা লাশের অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। তাই তিনি (সা.) বলেন, এই মহিলাকে বাধা দাও, এই মহিলাকে থামাও। হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আমি ভালোভাবে দেখার পর দেখতে পাই তিনি আমার মা হযরত সাফিয়া (রা.)। তাই আমি তার দিকে ছুটে যাই এবং শহীদদের লাশ পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বেই আমি তার পথে বাধ সাধি। তিনি আমাকে দেখে আমার বুকে ধাক্কা মেরে পিছনে সরিয়ে দেন। তিনি খুবই শক্তিশালী মহিলা ছিলেন। তিনি বলেন, সরে যাও, আমি তোমার কোনো কথাই শুনব না। আমি নিবেদন করি, মহানবী (সা.) আপনাকে এ লাশগুলো দেখতে বাধা দিতে বলেছেন। একথা শুনতেই তিনি থেমে যান এবং তার কাছে থাকা দু'টো কাপড় বের করে বলেন, এই কাপড় দুটি আমি আমার ভাই হামযার জন্য এনেছি, কেননা আমি তাঁর শাহাদতের সংবাদ পেয়েছি।

অতএব, এ ছিল সে যুগের আনুগত্য মান। অর্থাৎ মহানবী (সা.) বলেছেন, 'তাকে থামাও'– এ কথা শুনতেই (তিনি থেমে যান)। যদিও তিনি দুঃখ ভারাক্রান্ত এবং ভীষণভাবে আবেগাপ্লুত ছিলেন, তা সত্ত্বেও মহানবী (সা.)-এর নাম শোনামাত্রই তাৎক্ষণিকভাবে নিজের আবেগ-অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং দাঁড়িয়ে পড়েন। এটি হলো পূর্ণ আনুগত্য। তিনি বলেন, আমার ভাইয়ের জন্য আমি কাফনের কাপড় এনেছি। শাহাদতের সংবাদ আগেই পেয়েছি। তোমরা তাকে এই কাপড়ে কাফন দিও। আমরা যখন হযরত হামযা (রা.)-কে এই কাফনের কাপড় দু'টো পরিয়ে দাফন করতে যাচ্ছিলাম তখন দেখি, তার পাশেই এক আনসারী সাহাবী শহীদ হয়ে পড়ে আছেন, তার সাথেও সেই একই আচরণ করা হয়েছে যা হযরত হামযা (রা.)'র সাথে করা হয়েছিল। (তখন) আমরা এতে লজ্জা অনুভব করি যে, হযরত হামযা (রা.)-কে দুটি কাপড়ে কাফন দিচ্ছি আর এই আনসারী একটি কাপড়ও পাবেন না। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে, একটি কাপড় দিয়ে হযরত হামযা (রা.)-কে আর দ্বিতীয় কাপড়ে এই আনসারী সাহাবীকে দাফন করব। অনুমান করে বুঝলাম, এই দুই বুযূর্গের মধ্যে একজন (অপরজনের তুলনায়) দীর্ঘকায় ছিলেন। তখন আমরা লটারি করি আর যার ভাগ্যে যে কাপড় জুটে তাকে সেই কাপড়েই সমাহিত করি। **{মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৫২, হাদীস নংঃ ১৪১৮, মুসনাদ যুবায়ের বিন আল্**

আওয়াম (রা.), বৈরুতের আ'লেমুল কুতুব থেকে ১৯৯৮ সনে মুদ্রিত} হযরত হামযা (রা.)-কে একটি কাপড়েই কাফন দেয়া হয়েছিল। তাঁর মাথা ঢাকলে উভয় পা থেকে কাপড় সরে যেত আর চাদর পায়ের দিকে টেনে দিলে তার চেহারা থেকে কাপড় সরে যেত। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তার চেহারা ঢেকে দাও আর তার পা-এর ওপর হারমল বা ইযখার ঘাস দিয়ে দাও। হযরত হামযা (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ (রা.) যিনি তার ভাগ্নে ছিলেন, এ দুজনকে একই কবরে সমাহিত করা হয়। মহানবী (সা.) সর্বপ্রথম হযরত হামযা (রা.)'র জানাযার নামায পড়ান। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা লিইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬-৭, হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.), বৈরুতের দ্বারুল কুতুবিল্ ইলমিয়্যা থেকে ১৯৯০ সনে মুদ্রিত}, {মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৭২, হাদীস নংঃ ২১৩৮৭, মুসনাদ খাব্বাব বিন আল্ আরাত (রা.), বৈরুতের আ'লেমুল কুতুব থেকে ১৯৯৮ সনে মুদ্রিত}**

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) হযরত হামযা (রা.)'র লাশকে সামনে রেখে জানাযার নামায পড়ান। এরপর এক আনসারী সাহাবীর লাশ তার পাশে রাখা হয় আর তিনি (সা.) তার জানাযার নামায পড়ান। এরপর সেই আনসারী সাহাবীর মরদেহ সেখান থেকে সরিয়ে নেয়া হয় কিন্তু হযরত হামযা (রা.)'র লাশ সেখানেই রেখে দেয়া হয়। আর এভাবে তিনি (সা.) সেদিন হযরত হামযা (রা.)'র জানাযার নামায অন্য শহীদ সাহাবীদের সাথে ৭০বার পড়ান, কেননা প্রত্যেকবারই হযরত হামযা (রা.)'র লাশ সেখানেই থাকত। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা লিইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১, হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.), বৈরুতের দ্বারুল কুতুবিল্ ইলমিয়্যা থেকে ১৯৯০ সনে মুদ্রিত}**

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত হামযা (রা.) আত্মীয়স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং সকল পুণ্যকর্মে সর্বদা অগ্রগামী থাকতেন। শাহাদতের পর মহানবী (সা.) হযরত হামযা (রা.)'র লাশকে সম্বোধন করে বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারি তোমার ওপর বর্ষিত হোক। তিনি এমন ছিলেন যে, তার মতো আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী এবং পুণ্যবান অন্য কেউ আছে বলে (আমার) জানা নেই। আজকের পর তার ওপর আর কোন দুঃখ আপতিত হবে না। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা লিইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯, হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.), বৈরুতের দ্বারুল কুতুবিল্ ইলমিয়্যা থেকে ১৯৯০ সনে মুদ্রিত}** মহানবী (সা.)-এর চাচা এবং মুসলমানদের এই বীর নেতা হযরত হামযা (রা.)'র দাফন এমন নিঃস্ব ও অসহায় অবস্থায় হয় যে, (পরবর্তীতে) সাহাবীরা বড় বেদনার সাথে এর উল্লেখ করতেন। স্বাচ্ছন্দ্যের যুগেও হযরত খাব্বাব (রা.) সেই কষ্টের যুগের কথা স্মরণ করে বলতেন, হযরত হামযা (রা.)'র কাফন ছিল মাত্র একটি চাদর, তাও পুরো শরীর ঢাকতো না। তাই মাথা ঢেকে দিয়ে পায়ের ওপর ঘাস রেখে দেয়া হয়েছিল। **{মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৭১-৭২, হাদীস নংঃ ২১৩৮৭, মুসনাদ খাব্বাব বিন আল্ আরত (রা.), বৈরুতের আ'লেমুল কুতুব থেকে ১৯৯৮ সনে মুদ্রিত}**

অনুরূপভাবে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)'রও এ ধরনেরই ঘটনা রয়েছে যে, একবার রোযা রাখার পর ইফতারীর সময় খুবই আড়ম্বরপূর্ণ খাবার উপস্থাপন করা হলে তা দেখে তার কষ্টের যুগের কথা মনে পড়ে যায়। কাঠিন্যের যুগের কথা মনে পড়ে যায়। তিনি বলেন, হযরত হামযা (রা.)ও শহীদ হয়েছেন, তিনি আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। তিনি কাফনের চাদরও পান নি। এরপর আমাদের জন্য জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি হয়েছে, ইহজগতে যা পাওয়ার ছিল তা আমরা পেয়েছি। আমার আশঙ্কা হয় যে, কোথাও

আমাদের পুণ্যকর্মের প্রতিদান তাড়াতাড়ি দিয়ে দেয়া হয় নি তো। অর্থাৎ, এ পৃথিবীতেই দিয়ে দেয়া হয় নি তো! এরপর তিনি কাঁদতে আরম্ভ করেন আর এতটাই কাঁদেন যে, তিনি আর খেতেই পারেন নি। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব গযওয়াহ্ উহুদ, হাদীস নং: ৪০৪৫)**

এরা সেসব পুণ্যাত্মা ছিলেন যাদের প্রতি খোদা তা'লা সন্তুষ্ট এবং তারাও খোদার প্রতি সন্তুষ্ট। যারা স্বাচ্ছন্দ্যের যুগে নিজেদের ভাইদের স্মরণ করতেন। নিজেদের পূর্বের অবস্থাকে সামনে রাখতেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে জান্নাতের শুভসংবাদ দিয়েছেন। তিনি তাদের সবার প্রতি ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন আর তাদের মর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নত থেকে উন্নততর করতে থাকুন।

একটি রেওয়ায়েতে এসেছে আর এটি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)'র রেওয়ায়েত যে, মহানবী (সা.) উহুদ থেকে ফিরে আসার পর শুনতে পান, আনসার মহিলারা নিজেদের স্বামীর জন্য কাঁদছে এবং বিলাপ করছে। মহানবী (সা.) বলেন, ব্যাপার কী! হামযার জন্য কি কাঁদার কেউ নেই? এটি শোনার পর আনসার মহিলারা হযরত হামযা (রা.)'র শাহাদাতের কারণে বিলাপের উদ্দেশ্যে সমবেত হয়। এরপর মহানবী (সা.) তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন আর তিনি যখন জাগ্রত হন তখনো মহিলারা একইভাবে ক্রন্দন করছিল। তখন মহানবী (সা.) বলেন, এরা কি আজ হামযার জন্য কাঁদতেই থাকবে? তাদেরকে বল, তারা যেন ফিরে যায়। তখন মহানবী (সা.) তাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করে বলেন, তারা যেন নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যায় এবং আজকের পর যেন আর কোনো মৃত ব্যক্তির জন্য তারা মাতম বা বিলাপ না করে। **{মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল ২য় খণ্ড, পৃ: ৪১৮-৪১৯, হাদীস নং: ৫৫৬৩, মুসনাদ আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.), বৈরুতের আ'লেমুল কুতুব থেকে ১৯৯৮ সনে মুদ্রিত}**

এভাবেই মহানবী (সা.) মৃতের উদ্দেশ্যে বিলাপ করাকে অবৈধ আখ্যা দিয়েছেন আর যে কোনো প্রকার মাতম ও আহাজারির অবসান ঘটিয়েছেন। মহানবী (সা.) অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে আনসার মহিলাদের আবেগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। স্বামী এবং ভাইদের জন্য শোক প্রকাশ করতে বারণ করার পরিবর্তে প্রথমে তাদের দৃষ্টি হযরত হামযা (রা.)'র প্রতি নিবদ্ধ করেন, অর্থাৎ বৃহৎ জাতিগত দুঃখের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যা মহানবী (সা.)-এর জন্য সবচেয়ে দুঃখের কারণ ছিল। আর এরপর হামযার জন্য মাতম ও বিলাপ না করার জোরালো নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে নিজের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। তাদেরকে তিনি (সা.) ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দেন আর এমন নির্দেশ দেন যা খুবই প্রভাব বিস্তারী ছিল। হযরত হামযা (রা.)'র বিচ্ছেদে মহানবী (সা.) যে দুঃখ ও কষ্ট পেয়েছিলেন তা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিল।

হযরত হামযার (রা.)'র শাহাদতে হযরত কা'ব বিন মালেক তাঁর শোকগাঁথায় লিখেন, আমার চোখ অশ্রু বিসর্জন দেয় আর হামযার ইন্তেকালে যথার্থই তাদের ক্রন্দনের অধিকার রয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্‌র সিংহের মৃত্যুতে কান্নাকাটি এবং আহাজারির ফলে কী লাভ হতে পারে? আল্লাহ্‌র সিংহ হযরত হামযা যে প্রভাতে শাহাদত বরণ করেন, পৃথিবী তখন বলে উঠে, এই সুপুরুষ শাহাদত বরণ করেছেন । **{উসুদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৯, হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.), বৈরুতের দ্বারুল কুতুবিল্ ইলমিয়্যা থেকে ১৯৯৬ সনে মুদ্রিত}**

আল্লাহ্ তা'লা সাহাবীদের পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন। ত্যাগ-তিতিক্ষার যে দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করেছেন তা যেন মুসলমানরা চিরকাল স্মরণ রাখে। তারা যে উত্তম

আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং যেসব পুণ্যকর্ম করে আমাদের দেখিয়ে গেছেন তা করার তৌফিকও যেন (খোদা আমাদের) দান করেন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডন কর্তৃক অনূদিত)